সব শাসক দলই
দুর্নীতিগ্রস্ত কেন

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইণ্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

সব শাসক দলই দুর্নীতিগ্রস্ত কেন — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ১৮২৮, (০৩৩) ২২৬৫ ৩২৩৪

লেসার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

২০২২ সালের ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। ঐ জনসভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। ঐ আলোচনা গণদাবীতে প্রকাশের পর পাঠকদের পক্ষ থেকে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশের জন্য অনুরোধ আসে। সেই মতোই বর্তমানে তা পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হল।

৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩
১০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

সব শাসক দলই দুর্নীতিগ্রস্ত কেন

প্রভাস ঘোষ

কমরেড সভাপতি, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আপনারা সকলেই উপলব্ধি করছেন, দেশের কী অসহনীয় পরিস্থিতিতে আজ আমাদের দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে হচ্ছে। এই সভায় দুটি প্রস্তাব আপনাদের কাছে উত্থাপিত হয়েছে। সেগুলিতেও আপনারা শুনেছেন কী আন্তর্জাতিক, কী জাতীয়, কী রাজ্য— সমস্ত ক্ষেত্রেই, সব দিক থেকে এক ভয়ঙ্কর আক্রমণের সম্মুখীন আমরা। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা-সাধারণ সম্পাদক, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা এই সমস্যাগুলিকে কীভাবে বুঝতে পারি, আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি সে সম্পর্কে আমার উপলব্ধি অনুযায়ী কিছু কথা আপনাদের সামনে আমি রাখব।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র থাকলে আজ ইউক্রেন এ ভাবে আক্রান্ত হত না

আপনারা সবাই জানেন, গত বেশ কিছুদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ইউক্রেনের মতো একটা ছোট দেশকে আকাশপথে, জলপথে, স্থলপথে ঘিরে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং সেই দেশটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। এ কোন রাশিয়া! আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলছে, ফ্যাসিস্ট জার্মানি-ইটালি-জাপান সাম্রাজ্যবাদ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করছে, গোটা ইউরোপ প্রায় তাদের দখলে, ফ্রান্স পর্যন্ত জার্মান বাহিনীর দখলে এসে গেছে, ইংল্যান্ড প্রায় পরাজয়ের সম্মুখীন, সেইসময় মনীষী রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন সহ ইউরোপের প্রথিতযশা মনীষীরা এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধারা সবাই আতঙ্কিত।

মানবসভ্যতাকে বাঁচাবে কে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায়। তিনি প্রতিদিন যুদ্ধের খবর নিচ্ছেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, যখন রবীন্দ্রনাথ শুনতেন ফ্যাসিস্ট জার্মানি এগিয়ে যাচ্ছে, তিনি কষ্ট পেতেন, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। শেষ অপারেশনের দিন যখন শুনলেন মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রেড আর্মি জার্মানির অগ্রগতি খানিকটা ঠেকিয়েছে, তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, পারবে, এরাই পারবে। গোটা বিশ্বের মনীষীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তি সকলেই তখন তাকিয়ে ছিলেন সোভিয়েতের দিকে। মহান স্ট্যালিন তখন এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন। মার্শাল জুকভ লিখছেন, ওই বৃদ্ধ বয়সেও কখন যে স্ট্যালিন বিশ্রাম নিতেন, কখন ঘুমোতেন আমরা টের পেতাম না। যখন তখন তিনি ডাকতেন, যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালাতে হত। জার্মানির হাতে স্ট্যালিনের এক ছেলে বন্দি ছিল। জার্মানি প্রস্তাব দিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে বন্দি জার্মান সেনাবাহিনীর একজন মার্শালকে ছেড়ে দিলে স্ট্যালিনের ছেলেকে তারা ছেড়ে দেবে। স্ট্যালিন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, একজন সাধারণ লেফটেন্যান্টের সাথে একজন মার্শালের বিনিময় হতে পারে না। আমি জানি, ওরা হয়ত তার ওপর অনেক অত্যাচার করবে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সে তার পিতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বলেছিলেন, কী ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ! কত পিতামাতা সন্তানহারা হচ্ছে! এই স্ট্যালিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করে গোটা বিশ্বকে রক্ষা করেছিলেন।

ইউক্রেনে আধিপত্য কায়েম করতেই সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে যখন সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজশে, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রে এবং সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট ক্রুশ্চেভের চক্রান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হল, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শিরোমণিরা, পুঁজিপতিরা, আমাদের দেশের বুর্জোয়া সংবাদপত্র সকলেই উল্লসিত হয়ে বলেছে— রাশিয়ায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কী সেই গণতন্ত্র? আজকের পুতিনের রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন। সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার পর আজকের রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়ে একটা ক্ষুদ্র দেশে স্পেশাল মিলিটারি অ্যাকশনের নাম করে ভয়ঙ্কর আক্রমণ

চালাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামরিক জোট 'ন্যাটো' গড়ে তুলেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য। আজও ইউরোপের বুকে মার্কিন সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সেই সামরিক জোট সে বহাল রেখেছে। এতে সে ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার ভয়ে আতঙ্কিত ইউক্রেনও তাই চায়। আজকের এই সভার প্রস্তাবেও আমরা ন্যাটোর বিরুদ্ধে বলেছি। আমরা দাবি করেছি এই সামরিক জোট বাতিল হোক। আবার ইউক্রেন ন্যাটোতে যুক্ত হচ্ছে, এই অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার ইউক্রেনকে আক্রমণ করা চলে না। কাল যদি বাংলাদেশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী চিনের সাথে সামরিক চুক্তি করে যুদ্ধঘাঁটি বানায়, তবে তার প্রতিবেশী বলে ভারত কি বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে পারে? যদি ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে চুক্তি করে ভারতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলে— সেই অজুহাতে প্রতিবেশী চিন কি ভারতকে আক্রমণ করতে পারে? এমনটা চলে না। এই অজুহাত আক্রমণের অজুহাত। দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্ব— ইউক্রেনকে কারা করায়ত্ত করবে? ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বন্দর, সমুদ্রপথ সব কিছু দখল করতে রুশ সাম্রাজ্যবাদ এই আক্রমণ চালাচ্ছে। আবার ইউক্রেন হাতছাড়া হচ্ছে বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইউক্রেনকে সামরিক, অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আর একটা উদ্দেশ্য, ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে রাশিয়া ইউরোপে গ্যাস সাপ্লাই করবে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য রয়েছে এর মধ্যে। আর একটা জিনিসও রয়েছে— বর্তমানে পুঁজিবাদী রাশিয়ায় বাড়ছে বেকারত্ব, দারিদ্র। শ্রমিক শ্রেণি শোষিত, নির্যাতিত। এর বিরুদ্ধে চলছে প্রবল গণবিক্ষোভ। রাশিয়াতে আবার মানুষ জেগে উঠছে। ৮০ শতাংশ জনগণ রায় দিয়েছে আবার সমাজতন্ত্র আসুক। আবার মহান লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে হাজার হাজার মানুষ সংগঠিত হচ্ছে। তাই রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ আতঙ্কিত। তারা রাশিয়ার জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় এবং সেই জন্যও এই যুদ্ধ তাদের প্রয়োজন। আবার এই যুদ্ধ প্রয়োজন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও। তাদের দেশেও চলছে প্রবল বিক্ষোভ। কয়েক বছর আগে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন হয়ে গেল। ইউরোপেও চলছে শ্রমিক ধর্মঘটের বন্যা। গোটা বিশ্ব জুড়ে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। এই বিক্ষোভের থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই যুদ্ধকে ব্যবহার করা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন। প্রয়োজন নিজ নিজ দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা গড়ে

তোলা।

মহান স্ট্যালিন আগেই দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা তীব্র অর্থনৈতিক সংকট থেকে রেহাই পেতে 'মিলিটারাইজেশন অফ ইকনমি'র দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ অস্ত্র নির্মাণ এবং তার ব্যবসার উপরেই অর্থনীতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী শোষণে রিক্ত মানুষ আজ ভোগ্যপণ্য কিনতে পারছে না, ভোগ্যপণ্যের বাজার আজ সঙ্কুচিত। ফলে 'মিলিটারাইজেশন অফ দ্য ইকনমি' চলছে। অর্থাৎ অস্ত্র উৎপাদন করো, রাষ্ট্র জনগণের টাকায় সেই অস্ত্র কিনবে। আর এই অস্ত্রশিল্পের জন্য তার বাজার চাই। উৎপাদিত অস্ত্র ব্যবহার না করলে নতুন অস্ত্র উৎপাদন হবে না, তাই তার যুদ্ধের প্রয়োজন। তাই ইউক্রেনকে সাহায্য করার নামে অস্ত্র পাঠাচ্ছে আমেরিকা। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও তাদের অস্ত্রশিল্পকে চাঙ্গা করার কাজে এই যুদ্ধকে কাজে লাগাচ্ছে। আবার এই সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তিবৃদ্ধিও ঘটাচ্ছে। রুশ পুঁজিপতিদের হাতে থাকা বৈদেশিক বাজারও দখল করতে চাইছে।

অন্য দিকে ভারতের ভূমিকা আপনারা জানেন। ভারতের পুঁজিবাদী শাসকরা রাশিয়ার এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে না। এখানে ভারতের পুঁজিপতিদের স্বার্থও যুক্ত। ভারত চাইছে রাশিয়া থেকে সস্তা দামে তেল পাবে, জ্বালানি পাবে, অস্ত্র পাবে। এছাড়া, রাশিয়া ও চিনের যে ঐক্য আছে, তার জন্য চিন-ভারত সীমান্ত বিরোধে রাশিয়া যাতে সরাসরি চিনের পক্ষে না দাঁড়ায়, তার জন্য ভারত সরকারও রাশিয়ার এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করছে না। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে একটা দেশ ধ্বংস হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ হতাহত হচ্ছে, গ্রাম-শহর ধ্বংস হচ্ছে— ভারত কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না, বরং পরোক্ষে সমর্থন করছে। ইরাক মারণাস্ত্র তৈরি করছে এই অজুহাত খাড়া করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন ইরাক আক্রমণ করেছিল, ইরাককে ধ্বংস করেছিল, সেদিনও কিন্তু ভারতের পুঁজিবাদী শাসকরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দাঁড়ায়নি। সেদিনও তারা একই ভূমিকা পালন করেছিল। এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশই গণতন্ত্র ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী চরিত্র নিয়েছে

সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে, ইউক্রেনে যে যুদ্ধ চলছে, সেই যুদ্ধ গণতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের লড়াই। যেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এরা সব

গণতন্ত্রের প্রহরী, আর রাশিয়ায় চলছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। মহান লেনিনের শিক্ষা থেকে আমরা জানি, বহুদিন আগেই তিনি বলে গেছেন, পুঁজিবাদ তার প্রথম যুগে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে সেই পুঁজিবাদই এখন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধ্বংস করছে, মিলিটারি এবং বুরোক্রেসির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। মহান স্ট্যালিন বলেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার ঝান্ডাকে পুঁজিবাদ পদদলিত, কর্দমাক্ত করছে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এস ইউ সি আই (সি) প্রতিষ্ঠার এক বছর পরেই ১৯৪৯ সালে মহান শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশে আজ আর গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। উন্নত-অনুন্নত সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই আজ মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। তিনি বলেছেন, পুঁজি একচেটিয়া স্তরে এসে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জুডিসিয়ারি (বিচার বিভাগ) ও লেজিসলেটিভ (সংসদ, বিধানসভা)-এর ক্ষমতা খর্ব করে আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আর চিন্তার জগতে একদিকে অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ঐতিহ্যবাদের প্রবল চর্চা চালানো হচ্ছে। পুঁজিবাদ তার প্রথম যুগের গণতান্ত্রিক চেতনা, সেকুলার মানবতাবাদকে বর্জন করছে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ধ্বংস করে শুধুমাত্র কিছু টেকনিক্যাল কাজের লোক তৈরি করা হচ্ছে, কারিগরি বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যুক্তিবাদী মনন ধ্বংস করা হচ্ছে। বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দেশে এইভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির প্রয়োজনে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠছে। ফলে আজকের দিনে প্রতিটি দেশে যে দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে, তারা পুঁজিবাদের স্বার্থে এই ফ্যাসিবাদকেই মজবুত করছে। ভারতে কংগ্রেস শাসনে এটা শুরু হয়েছিল, আজ বিজেপি তাকে আরও মজবুত করছে। ফলে গণতন্ত্র বলতে আজ কোথাও কিছু নেই।

আমরা জানি ফরাসি বিপ্লবে উত্থাপিত স্লোগান 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা' আজ নিষ্ঠুর প্রহসনে পরিণত হয়েছে। গোটা বিশ্বে চলছে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য। ১ শতাংশ একচেটিয়া পুঁজিপতি মাল্টিন্যাশনালের হাতে গোটা বিশ্বের ৭০-৭৫ ভাগ সম্পদ কেন্দ্রীভূত। বাকি ৯৯ শতাংশ মানুষ রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা। আমাদের দেশের অবস্থাও ঠিক তাই। এখানেও বিজেপি শাসনে ১ শতাংশ পুঁজিপতি ৩২৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা সম্পদের মালিক, বাকি ৮৩ কোটি ভারতবাসীর দৈনিক আয় ২০ টাকা। ২০ কোটি মানুষ প্রতিদিন অনাহারে থাকে। কোথায় সাম্য, কোথায় মৈত্রী? গোটা বিশ্ব জুড়ে বারবার পরদেশ আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ,

ধর্মীয় ও জাতীয় সংঘর্ষ, হানাহানি— এই হচ্ছে পুঁজিবাদী মৈত্রী। আর স্বাধীনতাও হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ লুণ্ঠনের একচ্ছত্র স্বাধীনতা। অন্য দিকে কোটি কোটি শোষিত মানুষ পুঁজিপতিদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রতিবাদ, আন্দোলন সমস্ত জায়গায় নির্মম ভাবে দমন করা হচ্ছে। বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল পাঠ্যপুস্তকে আছে, বাস্তবে তা দাঁড়িয়েছে বাই দ্য মানি পাওয়ার, ফর দ্য মানি পাওয়ার, অফ দ্য মানি পাওয়ার। কার মানি পাওয়ার? এই সাম্রাজ্যবাদীদের, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, বহুজাতিক সংস্থাগুলির। আজ সব কিছুই এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংবাদমাধ্যম, আমলাতন্ত্র এদেরই দ্বারা পরিচালিত। গুণ্ডাবাহিনীও তারা পুষছে। মানি পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, ক্রিমিনাল ও মাসল পাওয়ার এবং মিডিয়া পাওয়ার— এরাই সমস্ত কিছু পরিচালনা করে, ভোটও এরাই ঠিক করে।

জনগণকে ভিখারি বানিয়ে তাদের মর্যাদাবোধও নষ্ট করছে তৃণমূল বিজেপি সহ বুর্জোয়া দলগুলি

আজ বিশ্বের সমস্ত দেশেই ইলেকশন ইজ এ বিগ ডিসেপশন। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি হ্যাজ টার্নড ইনটু এ ওয়ার্স্ট ফর্ম অফ হিপোক্রেসি, ফ্যাসিস্ট অটোক্রেসি (নির্বাচন একটা বিরাট প্রতারণা। সংসদীয় গণতন্ত্র পরিণত হয়েছে জঘন্য ভণ্ডামিতে, ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারে) দুনিয়ার সব জায়গাতেই। আমাদের দেশেও ভোটে কী হয় আপনারা জানেন। আমাদের দেশে এখন বিজেপি হোক, কংগ্রেস হোক, আরজেডি হোক, অকালি দল হোক, ডিএমকে হোক, এডিএমকে হোক, তৃণমূল কংগ্রেস হোক, সিপিএম হোক— ভোটের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তারা ইনভেস্ট করে। কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত, রোজগার নেই, খাদ্য নেই, চাকরি নেই, বাসস্থান নেই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই। প্রতিদিন শত শত মানুষ আত্মহত্যা করছে। আরও হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা। এই ক্ষুধার্ত মানুষকে তারা সরকার থেকে এক কেজি চাল, এক কেজি গম ভিক্ষা দেয়। তার সাথে 'আয়ুষ্মান ভারত', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'কন্যাশ্রী', বিভিন্ন 'শ্রী'— এগুলির মাধ্যমে তারা ভোটের আগে ইনভেস্ট করে। পঞ্চায়েতের অনুদানগুলিকেও একই ভাবে ব্যবহার করে সমস্ত রাজ্য সরকার, এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আজ এই পথ নিয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ একমুঠো ভাত পেলে অনেকটাই খুশি। তাদের শিক্ষা নেই, তাদের চেতনা নেই। অসচেতন, অজ্ঞ, অসংগঠিত, রাজনৈতিক চেতনাবর্জিত দুঃস্থ মানুষ আজ অসহায়। তারা জানে না, সরকারি

দয়াভিক্ষা নয়, সরকার থেকে চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান পাওয়া তাদের ন্যায্য অধিকার। তারা এটাও জানে না যে, সরকার তাদেরই টাকায় চলে, সেই টাকা থেকেই দান-খয়রাতি-ভিক্ষা দিয়ে দাতা সাজে, আর বেশিরভাগ টাকা আত্মসাৎ করে। তাই মনে করে, সরকার দয়া করে ভিক্ষা দিচ্ছে। গোটা দেশের জনগণকে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস ও অন্যরা এইভাবে ভিখারি বানিয়ে চিন্তা-চেতনা-মানসম্মান বর্জিত, ভিক্ষাবৃত্তির মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছে। সামান্য কিছু পেলেই জনগণ বলছে, তবু তো কিছু দিচ্ছে, তবু তো কিছু পাচ্ছি। এটাও একটা ভয়াবহ বিপদ। এই সব হচ্ছে ভোটের আগে। আর ভোটের সময় সবাই জানে গরিব পাড়ায়, বস্তিতে, মহল্লায় মহল্লায়, ক্লাবগুলিতে নানা স্থানে এই দলগুলি টাকা বিতরণ করে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকায় ভোট কেনা হয়। এক-একটা ভোট, দশ-বিশটা ভোট হাজার হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যায়।

এই টাকা কারা দেয়? এই দলগুলি দেয়? তারা কোথা থেকে পায়? এই টাকা দেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, এই টাকা দেয় বহুজাতিক সংস্থা, এই টাকা দেয় কালোবাজারিরা, মজুতদাররা, যাতে তারা অবাধে শোষণ-লুণ্ঠন চালাতে পারে। এই দলগুলি হচ্ছে এদের শোষণ-লুণ্ঠনের ম্যানেজার। ভোটের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ও ভোটের পরে সাধারণ মানুষকে লুণ্ঠন করে এরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লোটে। সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। সরকার চাইলে মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে না? এই দামবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই দায়ী। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে ঠিক। কিন্তু যে দামে ওরা কেনে, তার ওপরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৬৩ শতাংশ ট্যাক্স বসায়, তৃণমূল সরকার ৩৭ শতাংশ ট্যাক্স বসায়। ফলে ১০০ শতাংশ ট্যাক্স বসে। দুই সরকারই এর জন্য দায়ী। এর ফলে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি হয়, পরিবহণের ব্যয়বৃদ্ধি হয়। আর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মদতে এই সমস্ত বড় বড় পুঁজিপতিরা টাকা লোটে। আর একটা কারণ হচ্ছে, শিল্প-কৃষিজাত সকল সম্পদ উৎপাদনের পরেই চলে যায় ব্যবসায়ীদের কাছে, মজুতদারদের কাছে, কালোবাজারিদের কাছে। বহুদিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সরকার যদি জিনিসপত্রের দাম কমাতে চায়, তা হলে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করুক। কলকারখানার উৎপাদিত সম্পদ, কৃষির উৎপাদিত সম্পদ সরকার নির্দিষ্ট দামে কিনে নিক এবং সরকারই নির্দিষ্ট দামে দোকানের মাধ্যমে তা বিক্রি করুক। তা হলে মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণ ঘটতে পারে না। এই কথা একমাত্র আমরাই বারবার বলেছি। অন্য সমস্ত বামপন্থী দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। কারণ এদের

সকলেরই টিকি বাঁধা আছে মজুতদার, কালোবাজারিদের কাছে। এদের টাকাতেই এই দলগুলি ভোট করে, আর মানুষ টিভি দেখে, খবরের কাগজ পড়ে এই দলগুলির প্রচারে বিভ্রান্ত হয়। বহুদিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, জনগণ রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, অসংগঠিত। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম হাওয়া তোলে আর পুঁজিপতিদের মদতে দলগুলি টাকা ছড়ায়, সেই হাওয়ায় জনগণ উলুখাগড়ার মতো ভেসে যায়। এই হচ্ছে নির্বাচন, যেটা আসলে একটা প্রহসন। এই বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমই হাওয়া তোলে এবারে কার শক্তি বেশি, কে জিতবে, কে কাকে হারাবে, ফলে তাকেই ভোট দিতে হবে। কখনও বিজেপিকে, কখনও কংগ্রেসকে, কখনও সিপিএমকে, কখনও তৃণমূলকে, অন্য রাজ্যে অন্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলকে তুলে ধরে টিভিতে-কাগজে তারা ব্যাপক প্রচার চালায়। আর রাজনীতি অসচেতন, অসংগঠিত, দু-পয়সা রোজগারের জন্য সারাদিন খেটে চলা কর্মক্লান্ত সাধারণ মানুষও ভাবে এদের তো এতদিন দেখলাম, এবার ওদের দেখি। কিছুদিন বাদে আবার বলবে, এদের তো একবার দেখলাম, এবার ওদের দেখি। এই জিনিসই বারবার ঘটতে থাকে। ১৯৫২ সাল থেকে এ দেশে বারবার ভোট হয়েছে, মাঝে মাঝে সরকার পরিবর্তনও হচ্ছে। কিন্তু সঙ্কটগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জীবনের কি কোনও পরিবর্তন ঘটছে? বরং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সঙ্কট ক্রমাগত আরও বাড়ছে। নেতারা ভোটের আগে 'জনগণের সেবায় আকুল' হয়ে নানা প্রতিশ্রুতির ভাঁওতা দেয়। তারপর সব ধূলায় মিশে যায়। প্রশ্ন করলে বলে, ভোটের সময় এইসব করতে হয়। মানুষও ঠকে, তারপর হতাশ হয়ে বলে, 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'। এই তো চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এই জন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ভোট আর বিপ্লব এক নয়। ভোটে সরকার পাল্টায়, বিপ্লবে শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টায়। ফলে জনজীবনের সমস্যা সমাধান করতে হলে, শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে নির্বাচন নয়, চাই বিপ্লব। বহুদিন আগে এই কথা তিনি বলে গেছেন। আমাদের দল আজও এই কথা মেনেই চলছে।

এই একটি মাত্র পার্টি যাকে পুঁজিপতিরা কোনও দিন কিনতে পারবে না

আবার এ কথা ঠিক যে, আমরা নির্বাচনে লড়ি। মহান লেনিন বলেছেন, বিপ্লবীদের ততক্ষণ নির্বাচনে লড়তে হবে যতক্ষণ মানুষ নির্বাচনের মোহে আচ্ছন্ন থাকে। নির্বাচনের দ্বারা পার্লামেন্টে গিয়ে যে মানুষের সমস্যার সত্যিই কোনও সমাধান হয় না, এটা দেখাবার জন্য বিপ্লবী দলের নির্বাচনে যাওয়া দরকার। কিন্তু লেনিন এটা দেখে যাননি যে, একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই

কোনও বিপ্লবী দল বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের শরিক হতে পারে। ফলে, এই অবস্থার সৃষ্টি হলে কী করতে হবে, এই শিক্ষা তিনি দিয়ে যাননি। ১৯৬৭ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে হটিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ যখন যুক্তফ্রন্টকে জেতায়, তখন সেই যুক্তফ্রন্টে আমরা এবং আরও কিছু বামপন্থী দল একত্রে ছিলাম। যখন সরকার গঠনের প্রশ্ন এল, তখন লেনিনের এই শিক্ষাকে আরও বিকশিত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজ হবে সরকারের হাতে যতটুকু অর্থ আছে, তা গরিব মানুষের স্বার্থে ব্যয় করা। আর এই সরকার শ্রমিকের শ্রেণিসংগ্রাম, কৃষকের শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলনকে তীব্রতর করতে সাহায্য করবে, তাকে পুলিশি আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের এই গাইডেন্সের প্রবল বিরোধিতা করল সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস সকলেই। তখন তিনি বললেন, তা হলে আমরা সরকারে থাকব না। এর মাত্র কয়েক বছর আগে ডাঙ্গেকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে, 'বিপ্লব করব'— এই আওয়াজ তুলে কর্মীদের পক্ষে টেনে সিপিআই থেকে সিপিএম বেরিয়ে এসেছে। তাদের দলের কর্মীদের মধ্যে তখনও বিপ্লবের আকুতি ছিল। নেতারা দেখলেন, এই পয়েন্টে আমাদের সাথে ঐক্য ভাঙলে তাঁরা বিপদগ্রস্ত হবেন, তাঁদের কর্মীরা প্রশ্ন তুলবেন। ফলে তাঁরা মেনে নিলেন। ভাবলেন, এস ইউ সি আই ছোট দল, তারা কিছু করতে পারবে না। আমাদের বিপদে ফেলার জন্য শ্রম দপ্তর দিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শ্রমমন্ত্রী হয়ে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন, গণআন্দোলন পুলিশ দিয়ে দমন করবে না। প্রবল শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম, গণআন্দোলন গড়ে উঠল। গোটা ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা আতঙ্কিত হয়ে দাবি তুলল, এস ইউ সি আই-কে সরকার থেকে, মন্ত্রিত্ব থেকে সরাও। তাদের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিল। তারপরে ১৯৬৯ সালে আবার দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন গঠন হল, তখন পুঁজিপতিদের চাপে সিপিএম-বাংলা কংগ্রেস আমাদের হাত থেকে শ্রম দপ্তর কেড়ে নিল। এরপর ১৯৭৭ সালে সিপিএম আমাদের দলকে বাদ দিয়ে সরকার করল এবং ভোটের প্রাক্কালে জ্যোতি বসু দ্বিতীয় বেতার ভাষণে পুঁজিপতিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, এবার এসইউসিআই নেই, এবার আর যুক্তফ্রন্টের মতো অশান্তি, আন্দোলন হবে না। এসব অতীত দিনের ইতিহাস। এই ইতিহাস আপনাদের জানতে হবে।

আজও আমরা নির্বাচনে লড়ি কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষার

ভিত্তিতে। তিনি বলেছেন, একটা ভোটও না পাই না পাব, একটা সিটও না পাই না পাব, কিন্তু দলের বিপ্লবী লাইন নিয়েই আমরা চলব। আপনারা সকলেই জানেন, ভারতের জনগণ জানেন, যেখানে আমরা নির্বাচনে লড়ি আমাদের ক্যান্ডিডেটের যে জামানতের টাকা, তাও সংগ্রহ করি দরজায় দরজায়, রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলে। এই কাজ এই একটি মাত্র পার্টিই করে। আজকের এই মিটিংয়ের জন্যও কলকাতা শহরে, পশ্চিমবাংলার শহরে-গ্রামে আমাদের কর্মীরা ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলেছে। এই একটি মাত্র পার্টি যাকে আম্বানি-আদানি-টাটা-বিড়লারা কিনতে পারেনি, কিনতে পারবেও না। আমরা গরিব মানুষের দল, গরিব মানুষের সাহায্যেই আমরা দল চালাই। নির্বাচনেও আমরা সেইভাবেই লড়ি। ২০০১ সালে সিপিএম আমাদের সিটের অফার দিয়েছিল। আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। বলেছি, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে সংগ্রামী বামপন্থী পথে সরকার যদি চালান, তাহলে ভেবে দেখব। ২০১১ সালে তৃণমূল আমাদের মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। এই দল মন্ত্রিত্বের জন্য নয়, এই দল এমএলএ-এমপির জন্য নয়। আমাদের দলের অগ্রগতি মন্ত্রিত্বের জোরে হয়নি, সরকারের জোরে হয়নি, এমএলএ-এমপির জোরে হয়নি, সংবাদমাধ্যমের প্রচারেও হয়নি।

আপনারা জানেন ১৯৪৮ সালে মাত্র সাত জন সহযোদ্ধা আর গুটিকয়েক কর্মী নিয়ে এই দলের যাত্রা শুরু করেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর শহরের একটা ক্ষুদ্র হল থেকে। সেদিন কেউ এই দলের নামও জানত না। কোনও সংবাদপত্র এই দলের কথা বহন করেনি। আজও করে না। আজ তো সিপিএম হীনবল, ভোটে পর্যুদস্ত। তখন অবিভক্ত সিপিআই বিরাট শক্তিশালী পার্টি। মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে তুং তাদের সমর্থন করছেন। গোটা ভারতবর্ষে তাদের বিরাট প্রভাব। নেতাজি প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকও বিরাট পার্টি। অনুশীলন সমিতির সমর্থন দ্বারা পুষ্ট আরএসপি, সৌমেন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আরসিপিআই— সব বিরাট পার্টি। এরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে কমরেড শিবদাস ঘোষকে। বলেছে, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, এটা একটা পার্টি নয়, ক্লাব। সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ এর কোনও উত্তর দেননি। মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন এবং এই পার্টিটা গড়ে তোলার জন্য কঠিন কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন। সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের কোনও স্থায়ী আস্তানা ছিল না। ফুটপাতে, পার্কে, কোলে মার্কেটের ছাদে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়েছেন, দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়েছেন। তিনি নিজেই বক্তৃতায় বলেছেন, এমন দিন গেছে, দুটো পয়সাও জোগাড় করতে

পারিনি। আজ আমরা এতবড় মিটিং করছি, মঞ্চে চেয়ারে বসে আছি। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি একটি করে কর্মী সংগ্রহের জন্য মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটেছেন। সেদিন যারা কমরেড ঘোষকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, সেই ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআই আজ কোথায়? সিপিএম-ও বা কোথায়? সরকারি গদিচ্যুত হয়ে তারা হীনবল, হতাশায় আচ্ছন্ন। আমাদের দল কিন্তু বেড়েই চলেছে। পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও এলাকা নেই যেখানে শ্রদ্ধার সাথে আমাদের দলের নাম উচ্চারিত হয় না। কমরেড শিবদাস ঘোষও শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত একটা নাম। একদিন যাকে এরা ক্লাব বলে ব্যঙ্গ করেছিল, এই মুহূর্তে ভারতের ২৩টি রাজ্যে সেই পার্টির হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক আজকের এই সমাবেশের মতো কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতির তলায় লাল ঝান্ডা উড্ডীন রেখে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে। আমাদের দল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার অমোঘ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে। যতক্ষণ এই চিন্তা আমরা বহন করব ততক্ষণ আমরা শক্তিশালী থাকব, অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

নীতিহীন রাজনৈতিক নেতারা যুবকদের ক্রিমিনাল তৈরি করছে

নির্বাচন আজ সব দেশেই একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আর একটা মারাত্মক জিনিসও ঘটছে। এক দিকে মানুষকে ভিখারি বানিয়ে ক্ষুধার্ত বানিয়ে একমুঠো ভাত আর কয়েকটা টাকা দিয়ে এই সমস্ত দলগুলি তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করছে। অন্য দিকে সারা দেশে একটা সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী তৈরি করছে। বেকার যুবক যাদের চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, তারা যাতে বিক্ষোভের দিকে চালিত না হয় তার জন্য তাদের বলছে মদ খাও, জুয়া খেল, সাট্টা খেল, ছিনতাই কর, ডাকাতি কর— কোনও ভয় নেই, সরকারি দল বাঁচাবে। আর এরই ফলে এই যুবকদের মধ্যে যে বিবেক-মনুষ্যত্ব, তাকে এই পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের তল্পিবাহক সেবাদাস দলগুলি ধ্বংস করছে। যৌবনের প্রাণ মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে, তাকে অমানুষ বানাচ্ছে। অশ্লীল সিনেমা, ফিল্মস্টারদের নোংরা কদর্য কাহিনি, অশ্লীল সাহিত্য আর মদের প্রসার চলছে অবাধে। অল্পবয়সি কিশোর-কিশোরীরাও এই আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার তো পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খুলছে। এখন তো শুনছি দুয়ারে দুয়ারেও মদ পৌঁছে দেবে! এটা শুধু সরকারের টাকা রোজগার করার জন্য নয়। টাকা রোজগারের উদ্দেশ্য তো আছেই, তার সাথে যুবকদের নোংরামিতে মত্ত করে রাখাও তাদের উদ্দেশ্য। আর চলছে নোংরা যৌনতা,

নারীদেহ নিয়ে নোংরা আলোচনা, নারী দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তার জন্যই এত ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে। কত নারীর আর্তনাদ, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে খুন করছে। ছয় বছরের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধা, কেউই ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এই তো দেশের উন্নয়ন! এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে— মেয়ে তার বাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করছে। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জয়ধ্বনিতে, 'আচ্ছে দিন'-এর মন্ত্রধ্বনিতে বা হিন্দুত্ববাদ ও রামনবমীর ধর্মীয় জোয়ারে কি এই হাজার হাজার নির্যাতিত-ধর্ষিত নারীর আর্তনাদ চাপা পড়বে? এই অবস্থা দেখলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্র কী বলতেন? আজ দিনের পর দিন এই ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুনখারাপি বেড়েই চলছে। যুবকদের ক্রিমিনাল বানানো হচ্ছে। বাস্তবে ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স নয়, ক্রিমিনালাইজেশন বাই দ্য পলিটিশিয়ান হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষেই এটা হচ্ছে। এরা দেহের আকৃতিতে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিতে বিবেকবর্জিত, ন্যায়-অন্যায়বোধ বর্জিত, মনুষ্যত্ববর্জিত অমানুষ। এরা পশুরও অধম। আজ ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই পাড়ায় পাড়ায় এই যে ভয়ঙ্কর অবস্থা তা পুঁজিবাদের সৃষ্টি। বহু বছর আগে শরৎচন্দ্র পুঁজিবাদের এই আমনবিক রূপ দেখে গভীর বেদনায় শ্রীকান্ত উপন্যাসে বলেছিলেন, "সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে এ দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। ... সভ্য মানুষে এ কথা বোধহয় ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে মানুষকে পশু করিয়া লইতে না পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।" তিনি আরও বলেছিলেন, "মানুষের মরণ আমাকে বড়ো আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।" আজকের দিনের এই সর্বগ্রাসী অধঃপতন দেখলে তিনি কী বলতেন! এরাই ভোটের সময় পুঁজিবাদী দলের স্বার্থে সব কাগজপত্র কেড়ে নেয়, এরাই রিগিং করে, এরাই পাড়ায় পাড়ায় ভোটের সময় থ্রেট করে, বলে ভোট দিতে যাবেন না, আমরা দিয়ে দেব বা অমুক দলকে ভোট দিলে এই পাড়ায় আপনি আর থাকতে পারবেন না। এক দিকে এভাবে এইসব দলগুলির তথাকথিত 'উন্নয়নের যাত্রা' চলেছে, অন্য দিকে খুনখারাপি, বন্ধ ঘরে পুড়িয়ে মারা, নারীধর্ষণ বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ ও তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গের কম্পিটিশন চলছে। মন্ত্রীদের মনোভাব যেন এসব কোনও ঘটনাই নয়, খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। যেভাবেই হোক, দায়িত্ব এড়াতে পারলেই হল। এতটুকু দুঃখ-বেদনা,

অনুশোচনা নেই, প্রতিকার তো দূরের কথা। আর এ-সব দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষেরও গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে। যেন এ সবই চলবে, এর কোনও প্রতিকার নেই।

সর্বস্তরে দুর্নীতিই নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে

আর একটা বিপজ্জনক ঘটনা হচ্ছে, সর্বস্তরে দুর্নীতিই নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কেন্দ্র, রাজ্য কোনও সরকারেই ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না। যেন এটাই দেশের অঘোষিত আইন। এর কারণ পুঁজিবাদই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, অমানবিক, সভ্যতা বিরোধী, ফলে যে সব দল ও নেতা বুর্জোয়া রাজনীতির পথে চলছে, তারাই দুর্নীতিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করছে। সম্প্রতি আপনারা দেখেছেন বিজেপি শাসিত কর্ণাটকে এক কন্ট্র্যাক্টর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চিঠি লিখে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত জানিয়েও তিনি প্রতিকার পাননি। মন্ত্রী ৪০ শতাংশ কাটমানি দাবি করেছিল। তিনি দিতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। এর কি কোনও তদন্ত হয়েছে? এ তো অতি ছোট ঘটনা।

বিজেপি শাসিত কর্ণাটকে খনি কেলেঙ্কারি, মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম কেলেঙ্কারি, যেখানে হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা জড়িত, অথচ এর বিচার-শাস্তি কোনও কিছুই হয়নি। অভিযুক্তরা এখনও সগৌরবে মন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিজেপির আশীর্বাদপুষ্ট ব্যবসায়ী নীরব মোদি, মেহুল চোক্সি, বিজয় মাল্যরা বিদেশে নিশ্চিন্ত আরামে দিনযাপন করছে। বিজেপি আশ্রিত দুর্নীতিগ্রস্তদের কেশাগ্র স্পর্শ করার কোনও অধিকার সিবিআই, ইডির নেই। যে রাফাল বিমান ক্রয় চুক্তির দুর্নীতির সাথে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যুক্ত, যা ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্বারা স্বীকৃত, তাও সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তো এখন ইলেকশন 'জুমলায়' পরিণত। অথচ বিদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কালো টাকা জমছেই। রামমন্দিরের জন্য জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী বিজেপি শাসনে কীভাবে 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' চলছে, এর থেকেই তা স্পষ্ট। এই যে রাজ্যে রাজ্যে বিরোধী দলের সরকার ভাঙার জন্য এমএলএ কিনছে, এগুলিও কি দুর্নীতি নয়? সব রাজ্যেই কন্ট্র্যাক্ট পেতে হলে মন্ত্রী-নেতাদের প্রণামী দিতে হয়, তারপর বিল পাশ করাবার সময় কাটমানি দিতে হয়। তৃণমূল শাসিত এ রাজ্যেও শিক্ষকতার

চাকরির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, এখন মামলা চলছে। তা ছাড়া এ রাজ্যে পূর্বের সিপিএম শাসনের মতো তৃণমূল শাসনেও তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ এসব তো অবাধে চলছেই। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে তৃণমূল-আশ্রিত ক্রিমিনালদের লড়াইয়ে খুন-জখমও চলছে। এ ছাড়া নারীপাচার, শিশুপাচার এসবও আছে। সিপিএম শাসনের সাথে তৃণমূলের শাসনের এই প্রশ্নে পার্থক্য হচ্ছে, সিপিএম দল নিপুণভাবে সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে এসব করার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তৃণমূল দলের সবই ঢিলেঢালা, খোলামেলা।

সিপিএমের শাসনকালেও এ রাজ্যে স্তরে স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ঘটেছে। অন্যান্য আঞ্চলিক দলশাসিত রাজ্যগুলিতেও একই ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে এবং সাধারণ মানুষের এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে তারা মনে করে, নেতা-মন্ত্রীরা খাবেই। সবাই খায়। বড় জোর তুলনা চলে— কে বেশি খায়, কে কম খায়, কে খায় ও কাজ করে, আর কে খায় কিন্তু কাজ করে না। এর আর নড়চড় নেই। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে মানুষ নেতা-কর্মীদের সততা, নিষ্ঠা ও ত্যাগকে কত শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তখন আপসহীন পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে তো বটেই, এমনকি আপসমুখী বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া গান্ধীবাদী রাজনীতির শুধু নেতাদের মধ্যেই নয়, সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষ 'স্বদেশি' শুনলেই শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করত। আজ ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদ এমন সর্বাত্মক নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছে যে, রাজনীতির সেই গৌরবোজ্জল মান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আজ রাজনীতি জনগণের কল্যাণ ও জনস্বার্থের পরিবর্তে এইসব গদিসর্বস্ব, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, কপট, ধান্দাবাজদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পুঁজিবাদ যত দিন থাকবে, এই দুর্নীতি থাকবেই, বাড়বেই।

আর একটা সর্বনাশও এই দলগুলি করছে। ১০০ দিনের পরিবর্তে ২০/৩০ দিন কাজ করিয়ে বেশিরভাগ টাকা নেতারা আত্মসাৎ করছে আর গরিব মানুষকে সামান্য কিছু দিচ্ছে। বৃক্ষরোপণ, পুকুর কাটার নামে এসব চলছে। নেতা-মন্ত্রীরা তো দুর্নীতিগ্রস্তই, এভাবে গরিবদেরও বিনা কাজে বা অল্প কাজ করিয়ে যৎসামান্য মজুরি দিয়ে দুর্নীতির শরিক করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি যে টাকা বরাদ্দ করে, এইভাবেই স্তরে স্তরে তা আত্মসাৎ করে মন্ত্রী ও নেতারা। গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলে, তার অর্ধেক উপরওয়ালাকে দিতে হবে। সর্বস্তরে এটাই চলছে এবং জনগণও এটাই

স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। আইন আইনের পথে চলে না, চলে সরকারি দলের হুকুমে। কেন্দ্রে সিবিআই, ইডি যেমন বিজেপি-র হুকুমে চলে, এ রাজ্যেও থানা-পুলিশ তৃণমূলের নির্দেশেই চলে। সরকারি দলের খাতায় নাম থাকলে সাত-খুন মাফ, আর প্রতিবাদ করলে পান থেকে চুন খসারও দরকার নেই, সবসময় একেবারে খড়্গহস্ত। 'সুশাসন', 'আচ্ছে দিন', 'কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া', প্রতি বছর ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়া', 'জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেওয়া', 'কৃষকের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়া' এবং 'দুয়ারে সরকার', 'দিদিকে বল'— এসব শুধু বিজ্ঞাপনেই আছে এবং মানুষকে ঠকাচ্ছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলি সাধারণ মানুষকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। যার পরিণতি ঘরে-বাইরে খুবই ভয়ঙ্কর। ও হচ্ছে 'দুই নম্বরি'— এ কথা এখন প্রায় সবারই মুখে মুখে। মানুষ যদি দুর্নীতিকে অনিবার্য বিধান বলে মেনে নেয়, নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন আর দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলির বিরুদ্ধে ফাইট করার নৈতিক জোর থাকে না। এটা আরেকটা বিপজ্জনক সমস্যা।

রাজনৈতিক স্বার্থে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিষ ছড়ানো হচ্ছে

যেভাবে বিজেপি-আরএসএস একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যাকিংয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করে আজকে হিন্দুত্বের স্লোগান তুলে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সেটাও গণআন্দোলনের সামনে, শ্রেণিসংগ্রামের সামনে একটা বিরাট বিপদ। আপনারা গুজরাটের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে জানেন। পরবর্তীকালে নানা রাজ্যের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাও জানেন। আর সম্প্রতি মসজিদের সামনে রামনবমীর মিছিল নিয়ে উস্কানি দেওয়া, মসজিদের উপর পতাকা তোলা, আজান বন্ধ করা, বুলডোজার চালিয়ে মুসলিমদের ঘরবাড়ি, দোকান নিশ্চিহ্ন করা— এসবের মধ্য দিয়ে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে তারা। এর একটা উদ্দেশ্য আমি আগেই বলেছি, সেটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনে অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, পুরানো ঐতিহ্যবাদ জাগিয়ে তোলা— কংগ্রেস যা শুরু করেছিল, বিজেপি তাকে আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে গেছে। আর একটা কারণ হচ্ছে শোষিত জনগণের ঐক্য ধ্বংস করা। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই এইসব সমস্যায় জর্জরিত শোষিত মানুষ যাতে সরকারের বিরুদ্ধে না যায়, যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন না করে, তার জন্য জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি কর। তুমি হিন্দু, তোমার শত্রু কে? তোমার শত্রু মুসলিম। আবার মুসলিমদের বিপদ

কে? হিন্দু। এইভাবে একটা ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করা। একটা প্রচণ্ড উগ্র হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা, মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতা গোটা দেশে আজ চালাচ্ছে। আবার হিন্দুদের মধ্যেও নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণ কর্তৃক দলিত নিষ্পেষিত, পদদলিত হচ্ছে। পুজোর পর পুজো চলছে। সর্বত্র দেবদেবীর ছড়াছড়ি, রামের পুজো, হনুমান পুজো এসব চলছে, তারপর আমি বলতে পারি শুধু হনুমান পুজো কেন, বিভীষণ পুজোও করো। রামচন্দ্রকে লঙ্কায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল বিভীষণ। রামচন্দ্র জিততে পারত বিভীষণের সাহায্য ছাড়া? ফলে বিভীষণের পুজোও শুরু করো।

সমস্ত পার্টিই বিভিন্ন পুজো চালিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি তো করছেই, তার সাথে তাল দিয়ে অন্যান্যরাও করছে। আজ এ দেশে যত ধর্মচর্চার জোয়ার বইছে, তত সর্বত্র অধর্ম ও অন্যায় বাড়ছে। ইলেকশনের আগে সবাই ধর্মস্থানে ধরনা দিচ্ছে। এই জিনিস স্বদেশি আন্দোলনে ছিল না। রাজনৈতিক নেতাদের মন্দিরে মন্দিরে ধরনা দেওয়া, মানে ধর্মকে ব্যবহার করা— এসব ভণ্ডামি ছিল না। আর যারা হিন্দু ভোটও চায়, মুসলিম ভোটও চায়, যেমন তৃণমূল ও কংগ্রেস, তারা মন্দিরেও পুজো দেয়, আবার ঈদের সময় মাথায় ফেট্টি বাঁধে। উভয়কেই সন্তুষ্ট করা ভোট পাওয়ার জন্য। ফলে ভোট পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করা, হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক, আবার হিন্দুদের মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট, দলিত এসব আলাদা করে করে ভাগ করা হচ্ছে, আদিবাসীদেরও ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর একটা দুরভিসন্ধিও আছে। যত মানুষের মধ্যে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস বাড়ানো যাবে, তত সাধারণ মানুষ দুঃখ-দুর্দশার জন্য পুঁজিবাদকে, সরকারকে দায়ী করবে না। হিন্দুরা দায়ী করবে পূর্বজন্মের পাপের ফল, অদৃষ্টের লিখন, বিধাতার বিধানকে। মুসলিমরাও ভাববে, খোদা কা মর্জি, নসিব কা খেল। হিন্দু মৌলবাদের পাল্টা হিসাবে মুসলিম মৌলবাদীরাও মাথা তুলছে। এই ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষের বীজ ভয়ঙ্কর। মনে রাখবেন, বিজেপি ভোটে হারলেও এই বিষ থেকে যাবে এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবে, যদি না সর্বস্তরে ব্যাপক আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে একে পরাস্ত করা যায়।

বিবেকানন্দ না আরএসএস-বিজেপি, কে হিন্দু?

এখানে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বড় মানুষের কথা আপনাদের পড়ে শোনাব। তিনি বলছেন,

"ভারতের মুসলিম বিজয় নির্যাতিত গরিব মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। সেই জন্য এ দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল।

এসব শুধু অস্ত্রের জোরে হয়নি, অস্ত্রের জোরে আর ধ্বংস করে এ কাজ হয়েছিল এমন চিন্তা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জমিদারদের, পুরোহিতদের কবল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।"

তিনি বলছেন,

"কোনও ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করেনি, কোনও ধর্মই ডাইনি অপবাদে নারীকে পুড়িয়ে মারেনি, কোনও ধর্মই এই ধরনের অন্যায় কার্যের সমর্থন করেনি। তবে মানুষকে এইসব কাজে উত্তেজিত করল কীসে? রাজনীতিই মানুষকে এই সব অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে, ধর্ম নয়।"

তিনি আরও বলছেন,

"আমার যদি একটা সন্তান থাকত, তাকে মনঃসংযোগের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে এক পংক্তির প্রার্থনা ছাড়া আর কোনও প্রকার ধর্মের কথা আমি শিখতে দিতাম না। তার পর সে বড় হয়ে খ্রিস্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ যাঁকে ইচ্ছা উপাসনা করতে পারবে। ... সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।"

এই কথা যিনি বলেছিলেন তিনি আজ প্রয়াত। তাঁর সম্পর্কে বিজেপি নেতারা কী বলবেন? যিনি এ কথা বলছেন, বিজেপি কি তাঁকে হিন্দু বলবে? এ সব হচ্ছে বিবেকানন্দের কথা। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত বই থেকে আমি পড়ে শোনালাম। এই বিবেকানন্দু কি হিন্দু? নাকি আরএসএস-বিজেপি-র নেতারা হিন্দু? এই বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ মসজিদে নমাজ পড়েছেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছেন, আবার কালীপূজাও করেছেন। বলেছেন জল, পানি, ওয়াটার যেমন এক, ভগবান, আল্লা, গড-ও তাই। এঁরা কি হিন্দু ছিলেন? বাল্মিকী বা তুলসীদাস কারও প্রণীত রামায়ণে কি আছে, বাবর রামের জন্মস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে বাবরি মসজিদ করেছে? চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কি কখনও এই অভিযোগ তুলেছেন? অথচ আরএসএস-বিজেপি হীন রাজনৈতিক স্বার্থে রামজন্মভূমির জিগির তুলে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ বাবরি মসজিদ ভাঙলো, যেমন তালিবানরা আফগানিস্তানের বামিয়ানে ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি ভাঙলো। এখনও একের পর এক মসজিদ ভাঙার কাজ চলছে। ফলে বিজেপি-আরএসএস যা করছে, তার সাথে হিন্দু ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। এরা কোনও ধর্মকেই মানে না। এইমাত্র শুনলেন, বিবেকানন্দ বলেছেন ধর্ম হানাহানি শেখায় না, হানাহানি শেখায় রাজনীতি। কী সেই রাজনীতি? আজকের বিজেপি-আরএসএস-এর রাজনীতি হচ্ছে সেই রাজনীতি। ফলে যারা যথার্থই

হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী, তারা কোনও দিন আরএসএস-বিজেপির এই হিন্দুত্বকে সমর্থন করতে পারে না। আমরা মার্ক্সবাদী, নিরীশ্বরবাদী। বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদী দর্শনের সাথে আমাদের পার্থক্য আছে। কিন্তু বড় মানুষ হিসাবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তিনি মানবদরদি ছিলেন, জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁর এইসব বলিষ্ঠ বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করি। সমস্ত বড় মানুষকেই শ্রদ্ধা করতে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

যেমন তিনি বলেছেন,

"জনগণ শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে, তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ অশিক্ষার কালো মেঘ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, এই সব ভাবনা কি অস্থির করে তুলছে? তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলছে? দেশপ্রেমিক হওয়ার এই হল প্রথম সোপান।"

বিবেকানন্দ নির্ধারিত এই 'দেশপ্রেমিকতার প্রথম সোপানের' মানদণ্ডে বিচার করলে বিজেপি ও অন্যান্য সরকারি দলগুলির স্থান কোথায়, আপনারাই বিচার করবেন।

এই বিজেপির জন্মদাতা হিন্দু মহাসভার তীব্র সমালোচনা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪০ সালে ১৪ মে ঝাড়গ্রামের এক সভায় কী বলেছিলেন, এবার শুনুন। তিনি বলেছিলেন, "সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগকে ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোটভিক্ষায় পাঠিয়েছে।" ... ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, " আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কোনও চিরন্তন কারণ থাকতে পারে না— এটা নেই।... এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে ... স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককেও শত্রুরূপে গণ্য করা প্রয়োজন।" এ কথাও স্মরণ করা দরকার, নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ ছিল না। শাহনাওয়াজ, হবিবুর রহমান, রশিদ আলিরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই নেতাজির বক্তব্য ও ভূমিকার মানদণ্ডে আরএসএস-বিজেপির স্থান কোথায়?

বিজেপির শিক্ষানীতি নবজাগরণের চিন্তার বিরোধী

আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

বর্তমানে বিজেপি নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আনতে চাইছে, সংস্কৃত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে, শিক্ষার সিলেবাসের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনি আনছে, গীতা পড়াচ্ছে, স্কুলে সরস্বতী বন্দনা চালু করছে— এগুলি নবজাগরণ বিরোধী। ভারতীয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশ শাসককে চিঠি লিখছেন,

"সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এই দেশে ইতিমধ্যেই দু'হাজার বছর ধরে এই শিক্ষা চলে আসছে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে পুনরায় তাই চালু করছে। যার ফলে মিথ্যা অহংকার জন্মাবে। অন্তঃসারশূন্য চিন্তা, যেটা স্পেকুলেটিভ মানুষেরা করেছেন, সেটাই বাড়বে। বেদান্ত শিক্ষার দ্বারা যুবকরা উন্নত নাগরিক হতে পারবে না। বেদান্ত যেটা শেখায় সেটা হচ্ছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। উন্নততর ও উদার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি ও অন্যান্য কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা।'

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন,

"... কতগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। ... কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়, তবে ভ্রান্ত হলেও এই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরেজি পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলি বিরোধিতা করা।"

বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানতেন না। কোনও দিন পুজো করেননি। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। এই বিদ্যাসাগরের পদতলে ভারতবর্ষের সকলেই মাথা নিচু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না বলে যাননি। তা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ বলেছেন, বিদ্যাসাগর তাঁর অন্যতম নমস্য পুরুষ। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ফুলে এবং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ-নজরুল যে নবজাগরণের চিন্তা বহন করেছিলেন, ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানধর্মী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, আজ বিজেপি তার সবকিছু বাতিল করে দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা গীতা, মনুসংহিতা, সংস্কৃত শিক্ষা চালু করছে, ইতিহাসকে বিকৃত করে এমন দেখাচ্ছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের সব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারই প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিরা করেছেন। এইভাবে শিক্ষার্থীদের মননকে

সম্পূর্ণ বিপথে চালিত করছে, যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। তারা যা করছে সেটা ভারতের নবজাগরণের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে আরএসএস

এ কথাও আপনাদের জানা দরকার, যে বিজেপি-আরএসএস এত জাতীয়তাবোধের কথা বলে, গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই আরএসএস-এর কী ভূমিকা ছিল? আমার কাছে লেখা আছে, আমি পড়ে শোনাতে পারি।

'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড'-এ গোলওয়ালকার লিখছেন,

"... ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের উপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে।... তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা তাদের অন্তরে হিন্দুজাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্যপূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দু জাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু।"

এই বিচারের মানদণ্ডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, লালা লাজপত, বালগঙ্গাধর তিলক, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, ক্ষুদিরাম সহ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'দেশপ্রেমিক' তো নয়ই, বরং 'বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু'। আর এস এস-বিজেপির গুরু গোলওয়ালকরের এই উক্তি কি আপনারা মানতে পারেন? তাই কোনও আরএসএস নেতা, হিন্দু মহাসভার নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি। সাভারকর কিছুদিন অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আন্দামান জেলে থাকার সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছে দয়াভিক্ষার পিটিশন করে মুক্তি পান। সেই চিঠির কপি আমাদের হাতে আছে। এই সাভারকরই ১৯৩৭ সালে প্রথম বলেন হিন্দু আর মুসলিম আলাদা জাতি। ১৯৪০ সালে মহম্মদ আলি জিন্না সাভারকরের কথারই পুনরুক্তি করে পাকিস্তানের দাবি তোলেন। তা হলে দেশভাগের জন্য কে দায়ী? এর উত্তর কে দেবে? আরএসএস '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। হিন্দু মহাসভাও বিরোধিতা করেছিল। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবিভক্ত বাংলায়, সিন্ধু প্রদেশে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভার যুক্ত মন্ত্রিসভা ছিল। বাংলায় ফজলুল হক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি '৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। বলছেন, আমরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে, আমরা ব্রিটিশ

সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। লক্ষণীয়, সেই সময় নেতাজির নেতৃত্বে আইএনএ বাহিনীও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আজ সেই আরএসএস-বিজেপি দেশপ্রেমের শিক্ষা দিচ্ছে! এর চেয়ে প্রহসন আর কী হতে পারে! ফলে বিজেপি-আরএসএস নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী এবং যথার্থ হিন্দু ধর্মেরও বিরোধী। জনগণকে এগুলি ভেবে দেখতে হবে।

মার্ক্সবাদবিচ্যুত সিপিএম জনসমর্থন হারিয়েছে

এই পশ্চিমবাংলায় এক সময়ে ছিল বামপন্থার জয়জয়কার। এখানে অবিভক্ত বাংলায় যুগান্তর-অনুশীলন সমিতির মতো বিপ্লবী সংস্থার জন্ম। এখানেই সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার সৈনিক ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ-প্রীতিলতা, সূর্য সেন, আরও অনেকের জন্ম, পরবর্তীকালে যাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়ালেন আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেসের গান্ধীবাদীরা ছিলেন দক্ষিণপন্থী আর সুভাষচন্দ্ররা ছিলেন বামপন্থী। এই বামপন্থার প্রতি পশ্চিমবাংলার যে আবেগ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা ও তার যে বিরাট প্রভাব, তাকে ভিত্তি করেই অবিভক্ত সিপিআই একদিন শক্তি সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বাধীনতা আন্দোলনে সিপিআইয়ের ভূমিকা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, মার্ক্সবাদের নাম উচ্চারণ করলেও এই দল যথার্থ মার্ক্সবাদী দল হিসাবে গড়েই ওঠেনি। যেমন লেনিন বলেছিলেন, এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ঝান্ডা পরিত্যাগ করেছে, ফলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চাই। লেনিন এ-ও বলেছিলেন, রাশিয়ায় তথাকথিত মার্ক্সবাদী আরএসডিএলপি যথার্থ মার্ক্সবাদী দল নয়, বলশেভিক পার্টি গঠন করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষও গোটা স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে সিপিআইয়ের ভূমিকা দেখে বুঝেছিলেন, এই দলটি যথার্থ মার্ক্সবাদী নয়। ফলে ভারতবর্ষের বুকে একটি সঠিক বিপ্লবী মার্ক্সবাদী দল গঠন করতে হবে। এখানে যদি সিপিএমের কোনও কর্মী-সমর্থক থাকেন, তাঁদের আমি ভেবে দেখতে বলব, এই বাংলার জনগণের মধ্যে একদিন আপনাদের কী বিরাট প্রভাব ছিল। কী ভাবে একটার পর একটা মার্ক্সবাদবিচ্যুত ভূমিকা পালন করে আজ আপনারা এই জায়গায় পৌঁচেছেন যেখানে ক'পার্সেন্ট ভোট পাচ্ছেন সেটাই আপনাদের আত্মসন্তুষ্টির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিপিএমের অ-বাম রাজনীতি বিজেপির উত্থানের রাস্তা করে দিয়েছে

আপনাদের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ভারতের স্বাধীনতা

আন্দোলনের সময় মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, বৃহৎ বুর্জোয়ারা, মানে কংগ্রেসের গান্ধিবাদী নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সাথে বোঝাপড়া করছে। ভারতের কমিউনিস্টদের উচিত মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা। যেমন চিনের কমিউনিস্ট পার্টি মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে করেছিল। ভারতের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি মহান স্ট্যালিনের এই শিক্ষাকে কখনওই অনুসরণ করেনি। যখন কংগ্রেসের মধ্যে এক দিকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি গান্ধিবাদীরা, অন্য দিকে সুভাষচন্দ্রের আপসহীন নেতৃত্বের বিরোধ চলছিল তখন সিপিআই গান্ধিবাদীদের পক্ষে দাঁড়াল সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করে। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় সুযোগ এসেছিল সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে জাতীয় কংগ্রেসেই বামপন্থী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু এরা পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়ায়নি, বরং গান্ধিবাদীদের সমর্থন করেছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তারপরেও তিনি রামগড়ের অধিবেশনে সিপিআইকে ডাক দিলেন। বললেন, এসো, আমরা বামপন্থীরা একত্রিত হই এবং এর দ্বারা কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হবে। সেখানেও তারা যোগ দেয়নি। অতীতের এসব কথা আপনাদের জানতে হবে।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না, হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকর প্রথম 'হিন্দুরা এক জাতি, মুসলমানরা আলাদা জাতি' ঘোষণা করেন। তিন বছর পর মুসলিম লিগ এরই ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করে। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, তথাকথিত মার্ক্সবাদী দল সিপিআই-ও এই হিন্দুস্তান-পাকিস্তান তত্ত্বকে সমর্থন করেছিল। '৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, এতবড় অভ্যুত্থান— তার বিরুদ্ধে গেল সিপিআই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতা করতে হবে এই স্লোগান তুলে। সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদের পক্ষে কোনও দিন দাঁড়াননি। উনি জার্মানির সোভিয়েত আক্রমণেরও নিন্দা করেছিলেন। কৌশলগত কারণে জাপানের সাহায্য নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন। সেই কৌশল ঠিক কি বেঠিক সেটা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু সেটা কি এই জন্য করেছিলেন যে জাপান যাতে ভারতবর্ষ দখল করে? ১৯৪২ সালের ১০ জানুয়ারি সিপিআই তাদের মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এ সুভাষচন্দ্রকে জাপানের দালাল, কুইসলিং বলল। বলল, তাঁকে দেশদ্রোহী হিসাবে আমরা গণ্য করব। পরবর্তীকালেও প্যাটেল প্রতিক্রিয়াশীল, নেহেরু প্রগতিশীল এইসব কথা তারা বলেছে। এই ময়দানে বহু বার কমরেড ঘোষ আলোচনা করে

দেখিয়েছেন, ১৯৪৭ সালেই পুঁজিবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং ভারতীয় পুঁজিবাদ শুধু পুঁজিবাদ নয়, তা একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। এখানে বিপ্লবের স্তর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক, মূল শক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি ও খেতমজুর, মিত্র হচ্ছে গরিব চাষি ও মধ্যবিত্ত। অথচ সিপিএম-সিপিআই-এর তত্ত্ব হচ্ছে, ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। মিত্র কে? জাতীয় পুঁজিপতি, ধনী চাষি, জোতদার। যদিও তাদের কর্মীরা এইসব তত্ত্বগত আলোচনা বা বইপত্র এখন আর পড়াশোনা করেন না। তারপরেও একের পর এক মার্ক্সবাদবিচ্যুত ভূমিকা তারা পালন করে গেছে। তারা বলেছে, ইন্দিরা কংগ্রেস প্রগতিশীল, মোরারজি দেশাই-এর কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে যখন বিশাল গণআন্দোলন হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, চাকরি এইসব দাবিতে ছাত্র-যুবকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, পরবর্তীকালে জয়প্রকাশ নারায়ণ যুক্ত হওয়ায় যাকে 'জেপি মুভমেন্ট' বলা হয়, বামপন্থীরা নেতৃত্বে না থাকার জন্য সেই আন্দোলনের ফয়দা তুলল আরএসএস-হিন্দু মহাসভা-স্বতন্ত্র পার্টি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার সিপিএম-সিপিআইকে বলেছিলেন, এই আন্দোলনের দাবি গণতান্ত্রিক, জনগণও এই আন্দোলনের অংশীদার। আসুন, আমরা বামপন্থীরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিই, দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করি। তারা কিছুতেই রাজি হল না। সিপিআই তো সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করল, সিপিএম পরোক্ষে সমর্থন করল। মুখে বলল, দক্ষিণপন্থীরা আছে, আমরা যাব না। কমরেড ঘোষ বললেন, আমরা বামপন্থীরা না থাকার জন্য দক্ষিণপন্থীরা সুযোগ নিচ্ছে। ওরা রাজি হল না। নাহলে বিজেপি এত শক্তি বাড়াতেই পারত না। তারা শক্তি বাড়াল জেপি মুভমেন্টকে ব্যবহার করে। দক্ষিণপন্থীরা আছে এই অজুহাতে সিপিএম আন্দোলনে গেল না। আবার '৭৭ সালে এই দক্ষিণপন্থীরাই যখন জনতা পার্টি গড়ল, যার মধ্যে আরএসএস-জনসংঘও ছিল, ভোটে জিতবে বুঝতে পেরে রাতারাতি সিপিএম জনতা পার্টিকে সাপোর্ট দিল এটা জেনেই যে, এর মধ্যে জনসংঘ আছে, আরএসএস আছে। মোরারজি সরকারকে তারা সমর্থন করল, যার মন্ত্রী ছিলেন বাজপেয়ী-আদবানি। এই ময়দানেই জ্যোতি বসু-বাজপেয়ী একত্রে মিটিং করে গেছেন। পরবর্তীকালে ভিপি সিংকে বিজেপি-সিপিএম যুক্তভাবে সমর্থন করেছে। একের পর এক এগুলি তারা করে গেছে। কখনও স্বৈরাচারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির সাথে ঐক্য, কখনও সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে ঐক্য। অর্থাৎ যেখানে গেলে ভোটের সুবিধা হবে, এমএলএ, এমপি বাড়বে— সেখানেই তারা গেছে।

কংগ্রেসকে সেকুলার তকমা লাগিয়ে সিপিএম জনগণকে বিভ্রান্ত করছে

এখানে আর একটা কথা আমি আলোচনা করে যেতে চাই। কংগ্রেস, আরজেডি, ডিএমকে-কে সেকুলার বানাচ্ছে সিপিএম। কংগ্রেস কি সেকুলার? সেকুলারিজম কথাটার যথার্থ মানে কী? সেকুলার শব্দের অর্থই হচ্ছে পার্থিব। পার্থিব জগৎ ছাড়া অপার্থিব কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। ফলে রাজনীতির সাথে, শিক্ষার সাথে, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম যে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তিগতভাবে করুক। এটাই ছিল ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক যুগে সেকুলারিজমের ধারণা। আমাদের দেশে সুভাষচন্দ্র এটাই বলেছিলেন— রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতি চলবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। কিন্তু গান্ধিবাদী কংগ্রেস এটা মানেনি। বিজেপির এই শক্তিবৃদ্ধির আর একটা কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের রাজনীতি। তারা সেকুলারিজমের নামে সর্বধর্ম সমন্বয়ের চর্চা করেছে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের চর্চা করেছে। আর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নামে তখনকার দিনে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে শুধু মুসলিমরাই নয়, তথাকথিত নিম্নবর্ণ বা সিডিউলড কাস্ট যারা, তারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল না। পরবর্তীকালে কংগ্রেস ভোটের জন্য দাঙ্গা করেনি? ওড়িশার রাউরকেল্লা, বিহারের ভাগলপুর, আসামের নেলি, দিল্লির শিখ নিধন যজ্ঞ— এগুলি কি সেকুলারিজমের উদাহরণ? আবার উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি কাস্টিস্ট পার্টি, তামিলনাড়ুর ডিএমকে-এডিএমকে প্যারোকিয়াল ফোর্সেস। তাদের গায়ে সিপিএম সেকুলারিজমের তকমা লাগাচ্ছে স্রেফ ভোটের জন্য। শুধু তাই নয়, তারা কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক শক্তি বলছে। অথচ এই কংগ্রেস তার শাসনকালে কত নৃশংসভাবে গণআন্দোলন দমন করেছে, জরুরি অবস্থা জারি করেছে, একের পর এক ফ্যাসিস্ট আইন চালু করেছে, যেগুলি আজ আরও কঠোরভাবে বিজেপি ব্যবহার করছে। এগুলির দ্বারা সিপিএম তাদের নিজেদের কর্মীদেরও ঠকাচ্ছে, জনগণকেও ঠকাচ্ছে। এই পশ্চিমবাংলায় ৩৪ বছর সরকারে থেকে তারা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই, ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারে সিপিএমের বামপন্থাবিরোধী কার্যকলাপ দেখে আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, "এই পরিস্থিতিতে জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওত পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে, তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে।" আজ দেখুন, তাঁর এই

সতর্কবাণী কত সঠিক ছিল।

বামপন্থাকে কলঙ্কিত করে দক্ষিণপন্থার শক্তি বাড়িয়েছে সিপিএম

আর একটি বিষয় আপনাদের জানা দরকার। '৬৭ সালের পর '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট পুনরায় ক্ষমতায় আসে। পুলিশ দপ্তর সিপিএমের হাতেই ছিল। তারা বড় দল হওয়ার সুযোগ নিয়ে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলির উপর ব্যাপকভাবে হামলা চালাতে শুরু করে। সিপিএমের পক্ষে এলে চাকরি পাবে, সুযোগসুবিধা পাবে, তোলাবাজি, ছিনতাই, লুঠতরাজ, সিন্ডিকেটরাজ করার অধিকার থাকবে। থানা-পুলিশ সব ছিল তাদের কুক্ষিগত। এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সিপিএম। এইভাবে দল বাড়িয়ে তারা যুক্তফ্রন্টের অন্য দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। এমনকি তারা স্লোগান তুলেছিল পার্টিভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের আর দরকার নেই, এখন শ্রেণিভিত্তিক সরকার হবে। মানে সিপিএম এবং তার গণসংগঠনগুলির সরকার হবে।

১৯৭৩ সালে এইসব দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন,

"কেবলমাত্র মার্ক্সবাদের বুলি আওড়াতে আওড়াতে এবং বিপ্লবের নামাবলি গায়ে দিয়ে অবক্ষয়িত বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির দিকে এরা নিজেদের অধঃপতিত করেছে শুধু তাই নয়, মার্ক্সবাদের মতো এমন একটা উচ্চ আদর্শকেও এ দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং যুবসমাজ ছাত্রসমাজের কাছে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট পরবর্তী সময়ে ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস যে আক্রমণ করল তারও একটা কারণ যুক্তফ্রন্টের আমলে সিপিএমের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এইসব কার্যকলাপ। তাদের প্রভাব ছাত্রসমাজ, যুবসমাজের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের আমলে বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই দেখে শিক্ষিত মানুষ, সাধারণ মানুষ ভেবেছে সর্বনাশ, এই যদি মার্ক্সবাদীদের চেহারা হয়, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী হলে পাড়ায় পাড়ায় কমরেডদের মধ্যে যদি এই মূর্তি দেখতে পাই, তবে এমন মার্ক্সবাদের আমাদের দরকার নেই। এর ফলে পরবর্তীকালে দেখা গেল সাময়িকভাবে হলেও প্রতিক্রিয়ার হাত শক্তিশালী হল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের কথা বললেও যদি কোনও দল অধঃপতিত হয়ে যায়, দলের কর্মীরা কুসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতির শিকার বনে যায়, নোংরা কালচারকে প্রতিফলিত করে, কথাবার্তায় ভদ্রতা-শালীনতা না থাকে, আদর্শ, যুক্তিতর্কের রাস্তাকে এড়িয়ে গিয়ে গায়ের জোরে লোককে পদদলিত করতে চায়, যে কোনও যুক্তির আড়ালেই হোক না কেন, তা দিয়ে আক্রমণের প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে হাজার বার দাবি করলেও সেই দলের আদর্শ উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে গড়ে উঠতে পারে না। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ তো

হতেই পারে না।"

কমরেড শিবদাস ঘোষ '৭৭ সাল থেকে ৩৪ বছরের সিপিএম শাসন দেখে যাননি। তাদের এইসব আক্রমণ আরও মারাত্মক রূপ নিয়েছে তখন। এমনকি ঘরের ভিতরেও সিপিএমের বিরোধিতা করতে মানুষ ভয় পেত, ভাবত দেওয়ালেরও কান আছে। মেয়ের বিয়ে, বাবার শ্রাদ্ধ, জমি বিক্রি, বাড়ি ভাড়া— সর্বত্র সিপিএমের খবরদারি। প্রোমোটারি, কন্ট্র্যাক্টরি সব কিছু ওরা কন্ট্রোল করত। প্রত্যেকটি থানায় সিপিএমের লোক। কলেজের একটা পিওনের চাকরিও সিপিএমের সুপারিশ ছাড়া হত না। আজ তৃণমূল যা করছে, সবই সিপিএমের দেখানো পথেই। যদিও এরা আরও নগ্নভাবে তা করছে। সমস্ত জায়গায় একটা বিশাল ক্রিমিনালবাহিনী তারা রেখেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের ইলেকশনে কী ভাবে পিস্তল ব্যবহৃত হল আপনারা দেখেছেন। রিগিং সহ সব কিছু নির্বিচারে চালিয়েছে সিপিএম। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার জন্য কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন গুলি চালিয়ে দমন করেছে। '৭৭ সাল থেকে ৩৪ বছরের শাসনকে ভিত্তি করেই তারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কী ভয়াবহ অত্যাচার চালাল! নন্দীগ্রামে পুলিশের পোশাক পরা দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনী নামিয়ে ঘরে ঘরে মহিলাদের ধর্ষণ, গণধর্ষণ করেছে, গুলি চালিয়ে কতজনকে হত্যা করেছে। স্বাধীন ভারতে দলীয় ক্রিমিনাল দিয়ে মহিলাদের ধর্ষণ করে গণআন্দোলন দমন আর কেউ করেনি, যা সিপিএম করেছে।

আমরা ওদের এই ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি, আন্দোলন সংগঠিত করেছি। ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি-র মতো ওদের পায়ে আমরা দাসখত লিখে দিইনি। '৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর আমরা সিপিএম সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। আমরা বরেণ্য শিক্ষাবিদ সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল মুখার্জীর মতো আরও অনেককে যুক্ত করে ভাষা আন্দোলন করে প্রাথমিকে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য করেছি, পরিবহণের বর্ধিত ভাড়া কমাতে বাধ্য করেছি, হাসপাতালের চার্জ কমাতে বাধ্য করেছি, বিদ্যুতের মাশুল কমাতে বাধ্য করেছি, আরও বেশ কিছু দাবি আমরা মানতে বাধ্য করেছি। এইসব কারণে সিপিএম ক্ষিপ্ত হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, বর্ধমানে, পুরুলিয়ায়, নদীয়ায়, মুর্শিদাবাদে আমাদের প্রায় দুশো নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। তারা বলেছিল এস ইউ সি আই-কে মুছে দিতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে প্রধান নেতার নেতৃত্বে তারা আমাদের নেতা-কর্মীদের খুন করেছে, তার প্রধান সহকারী এখন তৃণমূলের বিধায়ক। এইভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে সিপিএম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

নীতি আদর্শ, তত্ত্ব কোনও কিছু নেই। আমাদের দল সরকারে আছে, চাকরি পেতে হলে এসো, না এলে চাকরি হবে না, প্রোমোশন পাবে না, ট্রান্সফার হয়ে যাবে। দলে না এলে গ্রামে চাষ বন্ধ করে দিয়েছে, পুকুরের মাছ মেরে দিয়েছে। সর্বত্র তাদের ক্রিমিনালবাহিনী, থানা-পুলিশ নেতাদের হুকুমে চলেছে। যে-কথা কমরেড ঘোষ সিপিএমকে বলে গেছেন যে, তোমরা মার্ক্সবাদকে, বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছ, এরপরে দক্ষিণপন্থা মাথা তুলবে।

আপনারা সকলেই জানেন, গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে দার্জিলিং থেকে শুরু করে পাথরপ্রতিমার সমুদ্র অঞ্চল পর্যন্ত সিপিএম কর্মীদের একটাই কথা ছিল— আগে রাম, পরে বাম। অর্থাৎ এখন বিজেপিকে ভোট দাও, তারপর আমরা আসব। এটা কি গণশক্তি লিখেছে? না লেখেনি। কিন্তু একই কথা সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তারপর তো ওদের থেকে দলে দলে সব বিজেপিতে যোগ দিল। ওদের ভোটব্যাঙ্ক ফেল করে গেল। এখন ভোটব্যাঙ্ক উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ওদের আর একদল তৃণমূলে চলে গেল। যে ক্রিমিনাল বাহিনীকে তারা পুষ্ট করেছিল, সেই বাহিনী এখন তৃণমূলকে সেবা করছে। এমনকি গত বিধানসভা ভোটেও মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য এক পীরজাদা ভাইজানকে হাজির করল সেকুলার বানিয়ে। এই ময়দানে একত্রে মিটিং করে গেল স্রেফ মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য। এই তো ওদের রাজনীতি!

সিপিএমের কুকর্ম দেখে মার্ক্সবাদ ও বামপন্থাকে বর্জন করবেন না

সিপিএম-এর নেতাদের কথা বাদ দিলাম, কারণ তাঁরা কখনও সৎভাবে নিজেদের ভুল স্বীকার করেন না। কিন্তু সিপিএম-এর কর্মীরা কি একবারও ভেবেছেন বা প্রশ্ন তুলেছেন যে, একটানা ৩৪ বছর এই রাজ্যে সরকার চালানোর পর তাদের এই দশা হল কেন? কেন পার্লামেন্টে, বিধানসভায় একটা সিটও পেলেন না? কেন জনগণ এত বামপন্থা বিরোধী হল? জনগণ তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক বিজেপিকেই সমর্থন জানাল, কিন্তু একবারও ৩৪ বছরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সিপিএমের কথা ভাবল না? এখন তাদের কোনও রকমে আত্মসন্তুষ্টি খুঁজতে হচ্ছে কোথায় কত পরিমাণ ভোট কিছু বেড়েছে, না হয় সগৌরবে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পেরেছে। তাদের মার্ক্সবাদবিরোধী সংগ্রামী বামপন্থাবিচ্যুত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সরকার পরিচালনার নীতিই যে এই সর্বনাশ করেছে, আজও নেতারা স্বীকার করছেন না। লেনিন বলেছিলেন, প্রকৃত কমিউনিস্টরা ভুল করলে অবশ্যই জনগণের সামনে স্বীকার করে, প্রকাশ্যেই ভুলের কারণ বিশ্লেষণ করে সংশোধনের পথ গ্রহণ

করে। আজ পর্যন্ত ওদের ইতিহাসে এটা দেখা যায়নি। কারণ তারা প্রকৃত কমিউনিস্ট নয়। শুধু অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেরা সাধু সাজার অপচেষ্টা করেছে। তারা কোনও দিনই মার্ক্সবাদী ছিল না। কিন্তু তাদের প্রথম যুগের নেতারা যে সংগ্রামী বামপন্থার চর্চা করতেন, আজ সেটাকেও তারা বর্জন করেছে। এখন তারা ভোটসর্বস্ব দল হয়ে গেছে। ওরা মার্ক্সবাদের নামে ভোটসর্বস্ব বামপন্থার চর্চা করছে। আর আমরা সংগ্রামী বামপন্থার পথে চলেছি। আপনাদের কাছে আবেদন, ওদের এসব কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মার্ক্সবাদ ও বামপন্থাকে বর্জন করবেন না। আমরা যথার্থ মার্ক্সবাদী হিসাবে সংগ্রামী বামপন্থার পথে চলছি। এখানেই ওদের সাথে আমাদের পার্থক্য, যেটা আপনাদের বুঝতে হবে।

পুঁজিবাদ মানবজাতির চরম শত্রু
চাই পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, শোষণ, অত্যাচার, জুলুম বাড়বে, বেকারত্ব, ছাঁটাই বাড়বে, মূল্যবৃদ্ধি বাড়বে। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ একচেটিয়া স্তরে এসে বহুজাতিক কর্পোরেশনের জন্ম দিয়েছে, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পুঁজি রপ্তানি করছে, কারখানা, খনি কিনছে। এই পুঁজিবাদের কাছে দেশ, জাতি বলে কিছু নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। যেখানেই সস্তায় মজুর, কাঁচামাল ও বিক্রির বাজার পাবে, সেখানেই সে ছুটবে। এই পুঁজিবাদেরই সেবা করেছে কংগ্রেস, আর এখন করছে বিজেপি। তাই পাবলিকের টাকায় তৈরি ব্যাঙ্ক, খনি, বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম, বিমা, পরিবহণ ইত্যাদি শিল্প পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার জন্য দিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকেও তাদের বাণিজ্যের জন্য দিচ্ছে। এমনকি যে কেন্দ্রীয় সরকারের দেশি-বিদেশি ঋণ ১৫২ কোটি ১৭ লক্ষ ৯১ হাজার ২৯ কোটি টাকা, যার সুদ দিতে ব্যয় হয় রাজস্বের ৫২.৪ শতাংশ, সেই বিজেপি সরকারই সদয় হয়ে পুঁজিপতিদের ৫০ লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স ও ঋণ ছাড় দিয়েছে। অন্য দিকে বিশ্বের ৩৩ শতাংশ ক্ষুধার্ত মানুষ ভারতের। তাদের জন্য সরকারের কোনও সাহায্য নেই।

শিল্পায়নের নামে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যতই ঢাক পেটাক, সেখানেও কোনও সম্ভাবনা নেই। আজ গোটা বিশ্বে ও ভারতে শোষিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় তীব্র বাজারসঙ্কট চলছে। মন্দার করাল গ্রাস চলছে। লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে।

ভারতেই গত তিন বছরে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ২২৩টি ছোটবড় কারখানা বন্ধ হয়েছে। ১২ কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেখানে ৯০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে সেখানকার সঠিক হিসাবই নেই। মধ্যবিত্তের সংখ্যা কমে গিয়ে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির আয় বেড়েছে ৪০০ শতাংশ, গৌতম আদানির বেড়েছে ১৮৩০ শতাংশ। এইভাবেই পুঁজিবাদী ধনকুবেরদের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটছে, আর জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত মুনাফার পাহাড়বৃদ্ধিই পুঁজিবাদের একমাত্র লক্ষ্য, জনগণের দুরবস্থা যতই বাড়ুক, দেশ, জাতির যা-ই সর্বনাশ হোক, কোনও কিছু নিয়েই তাদের এতটুকু মাথাব্যথা নেই, সমাজের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। পুঁজিবাদের সেবাদাস এই বুর্জোয়া দলগুলির নেতাদেরও একই হাল। যেভাবেই হোক, ছলচাতুরি, জোচ্চুরি, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, যে-কোনও পথেই হোক, ধর্মের নামে ভণ্ডামি করে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে হোক, ভোট পেতে হবে, মন্ত্রীত্বের গদি দখল করতে হবে, আর দু'হাতে টাকা লুটতে হবে। তাদেরও জনগণের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। এরই বিষময় প্রভাব পড়ছে সমাজজীবনে, পারিবারিক জীবনে। পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থই যেমন চূড়ান্ত, নেতাদের গদি দখলের স্বার্থই যেমন একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেও এসেছে চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা— যেভাবেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে, ফূর্তি করতে হবে, ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক দংশন, স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা লুপ্তপ্রায়। অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে মেরে যা কিছু সম্বল আছে আত্মসাৎ করে রাস্তায় বের করে দিচ্ছে, না হয় বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভালবাসার নামে ছলনা করে মেয়েদের ঘর থেকে বের করে এনে বিক্রি করে দিচ্ছে, এমনকি নিজের মেয়ে-বোনকেও বিক্রি করে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে দাম্পত্যজীবনে সন্দেহ-অবিশ্বাস-অশান্তি চলছে, সন্তানদের উপর তার ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়াও হচ্ছে। এই পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত অবক্ষয়ের স্তরে সারা বিশ্বে ও আমাদের দেশে সব দিক থেকে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ সভ্যতাবিরোধী, এ গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করছে। অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি-নৈতিকতা-মনুষ্যত্ব সব কিছুকেই ধ্বংস করছে। আজ বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের। বলছেন, ফসিল অয়েল, কার্বন গ্যাস, গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করো। মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, হিমালয়ের গ্লেসিয়ার গলছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে, তা ক্রমাগত উপকূলকে গ্রাস করবে। এই যে একটার পর একটা ঝড়ঝঞ্ঝা আসছে, ভূপৃষ্ঠের

উত্তাপ বাড়ছে— এসব কন্ট্রোল করার প্রয়োজন নেই পুঁজিবাদের। তার চেয়ে দূষণ চলুক, গ্রিন হাউস গ্যাস থাকুক, কারণ মুনাফা চাই। তাতে অক্সিজেন ধ্বংস হোক, ওজোন স্তর ধ্বংস হোক আপত্তি নেই— এই হচ্ছে পুঁজিবাদ। তার একমাত্র লক্ষ্য—সর্বোচ্চ লাভ, মুনাফা। আর কোনও দিকে তার নজর নেই। এই হিংস্র শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই চাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণআন্দোলন।

জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে

এই প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি সাধারণ মানুষকে ভেবে দেখতে বলব। এই যে আপনারা দীর্ঘ দিন ধরে বারবার প্রচারের হাওয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং সাময়িক কিছু সুবিধার লোভে কখনও এই দল কখনও ওই দলকে সমর্থন করছেন এবং বারবার ঠকছেন, এটাই কি চলতে দেবেন? ঠকবাজরা ঠকাবেই, কিন্তু আপনারা ঠকবেন কেন? আর এটা বন্ধ করতে হলে আপনাদের রাজনীতি বুঝতে হবে। আর 'আমরা ছাপোষা মানুষ', 'রাজনীতিতে মাথা ঘামাবার সময় নেই' বা 'আমরা অতশত বুঝি না'— এ সব বলে রাজনীতি এড়িয়ে চলার উপায় নেই। কারণ রাজনীতিই আপনাদের জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। জিনিসপত্রের দাম কী হবে, চাকরি জুটবে কি না, চাকরি থাকবে কি না, শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ থাকবে কি না, চাষের সার, বীজ পাওয়া যাবে কি না ইত্যাদি থেকে শুরু করে বিয়ে-শাদি, জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট সবই রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনে শত শত ছাত্র-যুবক-সাধারণ মানুষ আত্মবলিদান করল, কিন্তু তার বিনিময়ে দেশবাসী কী পেল? কারণ সেদিনও সাধারণ মানুষ রাজনীতি বুঝতে চায়নি। তাই বুঝতে পারেনি আপসমুখী বিপ্লববিরোধী গান্ধিবাদী নেতৃত্বের সাথে আপসহীন বিপ্লবী নেতাজির পার্থক্য কোথায়? বুঝতে পারেনি শ্রমিকবিপ্লব ভীত ভারতীয় পুঁজিবাদ -ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধর্মান্ধ গান্ধীজির সততাকে ব্যবহার করে 'অহিংসার' বাণী প্রচার করে দেশের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদকে, ক্ষুদিরাম, সুর্য সেন, প্রীতিলতা, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা খানদের বিপ্লবী সংগ্রামকে বাধা দিয়েছে এবং সেই কারণেই প্রথমে ষড়যন্ত্র করে নেতাজিকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে এবং পরে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেছে। এই ভাবেই জাতীয় কংগ্রেসে বুর্জোয়া নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করে সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যবহার করেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের পরিবর্তে ভারতীয় পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ কায়েম করেছে। এর

মর্মান্তিক পরিণাম কী ঘটেছে, সেটা প্রতিদিন আপনারা টের পাচ্ছেন। সেইজন্যই আপনাদের বলছি, যদি বারবার ঠকতে না চান, এই নিদারুণ দুঃখময় জীবনের হাত থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, তা হলে যত কষ্টকরই হোক, রাজনীতি আপনাদের বুঝতেই হবে। বুঝতে হবে কোন দল শত্রু, কোন দল মিত্রের ছদ্মবেশী শত্রু, আর কোন দল যথার্থই মিত্র। মনে রাখবেন, সমাজ ধনী-গরিবে, শোষক-শোষিতে, পুঁজিপতি-শ্রমিকে শ্রেণিবিভক্ত। সেই জন্য দলের শ্রেণিচরিত্র অবশ্যই বুঝতে হবে, বুঝতে হবে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির দল শোষিত জনগণের শত্রু। তাই খুঁজতে হবে, বুঝতে হবে কোন দল যথার্থই পুঁজিবাদবিরোধী শোষিত জনগণের, শ্রমিক শ্রেণির দল। আর সেই দলের নেতৃত্বেই সংঘবদ্ধ হতে হবে, লড়াই করতে হবে। আর দল বিচারের ক্ষেত্রে সংবাদের প্রচার, এমএলএ-এমপি-সরকারের শক্তি দেখলে আবারও ঠকতে হবে। বিচার করতে হবে, কার আদর্শ-নীতি-চরিত্র সঠিক, কোন দল পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের দল, আর কোন দল স্রেফ ভোটের দল, মন্ত্রীত্ব দখলের দল।

সংগ্রামী বামপন্থা শক্তিশালী হলে কৃষক আন্দোলন দেশ জুড়ে প্রতিবাদের বন্যা বইয়ে দিতে পারত

তাই শুধু আন্দোলন করলেই হবে না। আন্দোলন তো হচ্ছেই, দেশে দেশে মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। এই যে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন দুরন্ত শীত, তীব্র দাবদাহ, বর্ষা উপেক্ষা করে এক বছর ধরে চলল, ৭০০ জন প্রাণ দিলেন, অবশেষে সেই আন্দোলন দাবি আদায় করেছে। এই আন্দোলনে কংগ্রেস, এসপি, আপ সহ কোনও জাতীয় ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া পার্টি নামেনি। কারণ কেউই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চটাতে চায় না। মূলত পাঞ্জাবের কৃষকরাই এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে নির্বাচনে আপ তার সুবিধা নিয়েছে, এতদিন পাঞ্জাবে সরকারে ছিল কংগ্রেস, তার বিরুদ্ধে জনগণ ক্ষুব্ধ। এই আন্দোলনকারীরা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে স্লোগান তুললেও একচেটিয়া পুঁজিবাদ কী, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী, রাষ্ট্রব্যবস্থা কী এবং এর বিরুদ্ধে যে লড়তে হবে, না হলে বারবার আক্রমণ আসবে, এসব বোঝেননি। আমাদের সাধ্যমতো আন্দোলনরত কৃষকদের এগুলি বোঝাবার চেষ্টা করেছি আমরা। আমাদের পাশে আর কেউ ছিল না। একটা বিরাট সুযোগ ছিল। যদি সংগ্রামী বামপন্থা থাকত, সিপিএম-সিপিআই যদি ৫০-৬০ সালের সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা বহন করত, দিল্লির এই কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে গোটা

ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারত। তার ফলে শ্রমিক শ্রেণি উদ্দীপিত হত, শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের পরিস্থিতির অনেক অগ্রগতি হত। কিন্তু সেই সুযোগ নষ্ট হল। আমাদের একক শক্তিতে আমরা পারিনি, আমরা চেষ্টা করেছি। এই যে গত মার্চ মাসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দু'দিন দেশব্যাপী ধর্মঘট হয়ে গেল — পশ্চিমবঙ্গের জনগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমাদের কর্মীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে বনধ সফল করার জন্য। সিপিএমকে দেখতে পেয়েছেন? ওদের শুধু খবরের কাগজে পেয়েছেন। আর বনধের দিন বা তার আগের দিন কিছু লোকজন দাঁড় করিয়ে সংবাদপত্রে ছবি তোলার জন্য ওদের পাওয়া গেছে। এই হচ্ছে আজ তাদের অবস্থা!

ফলে যে কথাটা আমি বলতে চাই, পুঁজিবাদের এই ভয়াবহ আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চাই, আবার সেই আন্দোলনের মধ্যে চাই সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব, সঠিক রাজনৈতিক চেতনা, উন্নত নৈতিক বল। সর্বোপরি চাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, রাশিয়ায়, চিনে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ায় মার্ক্সবাদের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

রাশিয়া, চিনে সমাজতন্ত্র আছে কি নেই, তা দিয়ে মার্ক্সবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ হয় না

মনে রাখবেন, মার্ক্সবাদ একটা বৈজ্ঞানিক দর্শন। বিজ্ঞান যেমন পরীক্ষিত সত্য, মার্ক্সবাদও পরীক্ষিত সত্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে, চিনে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু লেনিন-মাও সে তুঙ কেউই এ-কথা বলেননি যে রাশিয়ায়, চিনে সমাজতন্ত্র শেষপর্যন্ত টিকে থাকলে তবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সঠিক প্রমাণ হবে। এটা একটা বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দর্শন। যে বিজ্ঞানের আলোকে এই বিদ্যুৎ চলছে, যে বিজ্ঞান নিয়ে পরিবহণ চলছে, যানবাহন চলছে, কৃষি চলছে, শিল্প চলছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গলে যাচ্ছে। যে বিজ্ঞান একটার পর একটা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন রহস্য উদঘাটন করছে। বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কৃত সত্যকে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত নিয়মকে মালার মতো গেঁথে নিয়ে কো-অর্ডিনেট, কো-রিলেট করে, এর থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন মার্ক্স। এটাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, এটাই মার্ক্সবাদ। রাশিয়ায়, চিনে যদি বিপ্লব নাও হত, তা হলেও বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসাবে মার্ক্সবাদের সঠিকতা থাকত। যে নিয়মে প্রকৃতি চলছে,

প্রাণীজগৎ, মানবজীবন, সমাজজীবন চলছে, ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে, মার্ক্স সেই নিয়মগুলিকেই আবিষ্কার করেছেন যাতে মানুষ সচেতনভাবে সেই নিয়মগুলিকে ব্যবহার করে সমাজ পরিবর্তন করতে পারে, প্রগতির গতিকে অব্যাহত রাখতে পারে। মার্ক্স দেখিয়েছেন, এই নিয়ম অনুযায়ীই প্রথমে আদিম সমাজ, তারপর দাস ব্যবস্থা, পরে সামন্ততন্ত্র এবং তারপরে পুঁজিবাদ এসেছে। এর পরে সমাজতন্ত্র আসবে, পরবর্তী কালে আরও উন্নত সমাজ কমিউনিজম আসবে। তারপর ক্রমাগত আরও উন্নততর সমাজ আসতেই থাকবে। এটা ইতিহাসের অনিবার্য গতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মহান লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লব করেছিলেন। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র দেখিয়ে দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কী করতে পারে! সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন একটা দেশ ছিল যেখানে বেকারি বলে কিছু ছিল না, ছাঁটাই বলে কিছু ছিল না, মূল্যবৃদ্ধি বলে কিছু ছিল না, অনাহারে মৃত্যু ছিল না, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ছিল না। সেখানে মানুষ বিনা পয়সায় জল পেত, জ্বালানি পেত, বিদ্যুৎ পেত, অল্প দামে খাদ্যদ্রব্য পেত, বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ ছিল, বিনা পয়সায় শিক্ষার সুযোগ ছিল একেবারে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত, আদালতে কোনও পয়সা লাগত না। যেখানে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক সকলের দায়িত্বই রাষ্ট্র নিয়েছিল। সে দেশ বিজ্ঞানে বিশাল অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, সেখানে শ্রমিকরা পারিশ্রমিক সহ বছরে ১৫ দিন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চিকিৎসার সুযোগ পেত, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিয়েছিল। সেখানে রাষ্ট্র গ্রামে-শহরে সিনেমা হল, থিয়েটার হল, লাইব্রেরি করে দিয়েছিল যাতে শ্রমিক-কৃষকরা জ্ঞান অর্জন করতে পারে, বিনোদনের সুযোগ পায়। সেখানে ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে দিনে ৭ ঘণ্টা, ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম চালু করেছিল। সেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই সমাজতন্ত্র দেখে বার্নার্ড শ মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, গণতন্ত্র আছে রাশিয়ায়, যেখানে স্ট্যালিন আছেন। রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে রাশিয়ার শ্রমিকরাই শুধু ক্রীতদাস হবে না, মানবসভ্যতা কয়েক শতাব্দী অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, রাশিয়া দেখিয়েছে যথার্থ সভ্যতা কাকে বলে। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। মৃত্যুর তিন বছর আগে অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ এমন পর্যন্ত লিখেছিলেন,

"... নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও

আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের ওপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব— এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ... নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে, যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।"

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে এসে লিখলেন 'সভ্যতার সঙ্কট'। কোন সভ্যতার সঙ্কট? এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। অহিংসার পূজারি হয়েও লিখেছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, যাবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে সংগ্রামের তরে যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' কে সেই দানব? সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ। এই রবীন্দ্রনাথ অন্য রবীন্দ্রনাথ। শেষজীবনে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদের বিপদ দেখে এইসব কথা উচ্চারণ করেছিলেন। এঁরা বেঁচে থাকলে, রাশিয়া-চিনে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় দেখলে চোখের জল ফেলতেন। আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে, কেন রাশিয়া-চিনে প্রতিবিপ্লব ঘটতে পারল এবং এ-রকম বিপর্যয় যে ঘটতে পারে, তারও ব্যাখ্যা মার্ক্সবাদ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং এবং শিবদাস ঘোষ সকলেই মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন এবং সমাজতন্ত্রে সঙ্কটের কারণ ও সমাধানের পথও দেখিয়েছেন। ফলে মার্ক্সবাদই একমাত্র মুক্তির পথ, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র রাস্তা। রাশিয়া-চিনের প্রতিবিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্ক্সবাদের পথেই আগামী দিনে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে।

মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে ঘরে ঘরে আরও ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা চাই

আজ আমাদের সামনে দু'টি পথ— একদিকে পুঁজিবাদ, না হয় সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদ টিকে থাকলে এইসব সঙ্কট বাড়তেই থাকবে। আর এর থেকে বাঁচতে হলে চাই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব সফল করতে হলে একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে আপনাদের আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই দলকে আপনারা সাহায্য করছেন, আরও ব্যাপকভাবে সাহায্য করুন। আপনাদের পরিবারগুলি থেকে আরও সংগ্রামী যোদ্ধা চাই। আজ সিপিএম যুবক কর্মী পায় না, আমরা কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় তরুণ-যুবকদের পাচ্ছি। ওরা যুবকদের টানত চাকরির লোভে, টাকার লোভে। আমরা

যুবকদের পাচ্ছি আদর্শের শক্তিতে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। আমাদের আরও যুবক চাই যারা ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো লড়বে, প্রীতিলতার মতো আত্মাহুতি দেবে। আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনাদের ঘর থেকে সন্তানদের দিন। বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন করব, এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না। অতীতের ঊনবিংশ শতাব্দীর, বিংশ শতাব্দীর বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের থেকে শিক্ষা নিন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সরকারি দলের লোভে, পদের লোভে, খেতাবের লোভে, কমিটির লোভে আপনারা বুদ্ধিকে বিক্রি করবেন না। অথবা, এ দেশে কিছু হবে না, রাজনীতি বুঝে লাভ নেই, সবাই সমান— এই সব কথা বলে মনের দরজা বন্ধ করবেন না। মনে রাখবেন, কেউ রক্ষা পাবেন না। আগুন জ্বললে তা কুঁড়েঘরও ধ্বংস করে, অট্টালিকাও ধ্বংস করে। প্লাবন এলে কুঁড়েঘর, অট্টালিকা কিছুই রক্ষা পায় না। আজ চতুর্দিকে ধ্বংসের আগুন জ্বলছে। এ কোনও কিছুকেই রক্ষা করবে না। এই মুহূর্তে অন্ধকারে ভারতবর্ষের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য অসহায় মানুষের আর্তনাদ, বুভুক্ষু সন্তান কাঁদছে, পেটে দেওয়ার জন্য খাদ্য নেই, এখানে সেখানে অন্ধকারে নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, দেহ বিক্রি করে সামান্য কিছু রোজগারের আশায়। তাদের স্বামী-পুত্র-কন্যা আছে, রুজি-রোজগার নেই। দেহ বিক্রির বাজারে আজ তারা পণ্য। এই অন্ধকারেই বহু নারী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, বহু নারী বাজারের পণ্য হয়ে যাচ্ছে। এই অন্ধকারেই বহু ধর্ষিত নারী আর্তনাদ করছে। এক দিকে এই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি, অন্য দিকে যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, শোষণ-অত্যাচার আরও বাড়বে, দারিদ্র বাড়বে, ঘুষ চলবে, লুণ্ঠন চলবে, দুর্নীতি চলবে, গুণ্ডামির রাজত্ব চলবে, নেতাদের ভণ্ডামি চলবে, ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদ বাড়বে, ক্ষুধার্ত মানুষের আরও মৃত্যু ঘটবে। এ জিনিস চলতে থাকবে, বাড়তে থাকবে। আর যদি এর থেকে মুক্তি চাই, সেই মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত পথ, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ। আজ ভারতবর্ষের জনগণকে ঠিক করতে হবে, তারা কি এই পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন টিকিয়ে রাখবেন, ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী হতে দেবেন, নাকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ গ্রহণ করবেন।

এ দল আপনাদের, একে রক্ষার দায়িত্বও আপনাদের

আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আরেকটা আন্দোলনও সৃষ্টি করেছি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন নবজাগরণের মনীষী, ভারতবর্ষের

বিপ্লবী ধারার যাঁরা যোদ্ধা, তাঁদের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, এ দেশের যুবকদেরও অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাই এঁদের জয়ন্তী উদযাপন করতে হবে। এখান থেকে একটু দূরেই পাবেন শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত আমাদের দলের পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড তাপস দত্ত এই মহান বিপ্লবী যোদ্ধার মূর্তি নির্মাণ করেছেন। দেশব্যাপী আমাদের কর্মীরা এইসব বড় মানুষদের, বিপ্লবী যোদ্ধাদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। তিনি বলেছেন, এঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের যোদ্ধা। প্রথমে এঁদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আবার আমাদের লড়তে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। তাই এঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে, আবার তার থেকে ছেদ ঘটিয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম করতে হবে। এই সাধনাই আমাদের দলে চলে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে যে সব ভাল গুণের আপনারা প্রশংসা করেন, তারও উৎস কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে মানুষকে জয় করবে ভালবাসা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, সুশালীন ও ভদ্র আচরণ দিয়ে। মিথ্যা দিয়ে নয়, গায়ের জোর, কুৎসা ও চালাকি দিয়ে নয়। আমরা এই শিক্ষাই অনুসরণ করছি। আপনাদের কাছে আবেদন, যদি কোথাও আমাদের দলের কোনও নেতা ও কর্মীর মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখেন, আপনারা সমালোচনা করবেন। কারণ এই দল আপনাদের, এই দলকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদেরই। এই আবেদন রেখেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।